জানুয়ারি, ২০১৯

জার্মান প্রবাসে

এক টুকরো বাংলাদেশ

পাঠশালা

পুরানো সেই দিনগুলি...

আমাদের কথা

জার্মান প্রবাসের এবারের সংখ্যা “পাঠাশালা" তে আপনাদের সুস্বাগতম। তবে শুরুতেই আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই, এই জানুয়ারি মাসেই আপনাদের এই ম্যাগাজিনের পাঁচ বছর পূর্তি হল। পাঁচ বছর পূর্তিতে এই ম্যাগাজিনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

পাঁচ বছরের পথচলা আমাদের মসৃণ ছিল না। মসৃণ ছিল না একারণে নয় যে আমাদের চলার পথে কেউ কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। মসৃণ ছিল না কারণ আমাদের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক সমস্যার দরুণ ম্যাগাজিন অনিয়মিত হয়ে পড়ায়। এসবকিছুরই সাক্ষী আপনারা নিজেরাই। পড়ালেখা, চাকরি-বাকরি, ভিসা, টাকাকড়ি ইত্যাদি জানা-অজানা নানা সমস্যার পরেও যখনই সুযোগ পেয়েছি তখনই ম্যাগাজিন আপনাদের তুলে দিতে চেষ্টা করেছি। আর এটি সম্ভব হয়েছে আপনাদের কার্যকর অংশগ্রহণের কারণেই। সবচেয়ে বড় ধন্যবাদার্হ তাই আপনারাই।

একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে সোনালী সময় ছেলেবেলা। সেসময়ের বন্ধুরা, পাড়া-প্রতিবেশি, স্কুলের সাথীরা, খেলাধুলা সবই যেন স্বর্ণালী হয়ে আমাদের সকলের হৃদয়ে চিরকালের জন্য গেঁথে রয়েছে। সে নিয়েই আপনাদের কাছে লেখা চেয়েছিলাম। এ সংখ্যার দারুণ সব লেখা লিখেছেন ইমন বায়েজিদ, রিম, তুর্য, বীথি, অপু। পরিশেষে ইমন আর সামির পাঠানো অসাধারণ ছবিগুলো ম্যাগাজিনকে দিয়ে পরিপুর্ণতা।

লেখাগুলো আপনাদের মন যোগাবে সেটিই আমাদের একমাত্র চাওয়া। আপনাদের যেকোন মতামত ভালোলাগা আমাদের জানাবেন।

ধন্যবাদান্তে
টিম জার্মান প্রবাসে

রোববার
২৭ জানুয়ারি ২০১৯
১৪ মাঘ ১৪২৫

জার্মান প্রবাসে

সূচিপত্র

৪ এক যে আছে বগুড়া জিলা স্কুল- সৈয়দ আসাদুজ্জামান অপু

৬ ইশকুলের ডায়েরি- ডঃ রিম সাবরিনা জাহান সরকার

৮ লীলাবতী- ইমন বায়েজিদ

১০ উৎসবে মাতি,কাছে কিবা দূরে- নওশাদ তূর্য্য

১২ কানে ধরার দল- জান্নাতুল নাঈম বীথি

১৩ ফটো গ্যালারি- ইমন বায়েজিদ

১৫ ধূসর সময়ের গল্প- যুবায়ের হোসাইন সামি

১৮ নোটিশ বোর্ড

আপনার একটা চাওয়া, একটা মন্তব্য অথবা আপনার কোন অভিজ্ঞতা ভাগ করুন না আমাদের সাথে! চটজলদি লেখা পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়ঃ german.probashe@gmail.com । পাঠকের আনন্দে পূর্ণ হোক আমাদের সার্থকতা।

এক যে আছে বগুড়া জিলা স্কুল

সৈয়দ আসাদুজ্জামান অপু

অনেকদিন পর বগুড়া জিলা স্কুল ‘০৫ ব্যাচ এর কিছু সুন্দর স্মৃতি নিয়ে লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এতো সব ভাল ভাল স্মৃতি আছে যে আমি স্মৃতিবেদনাতুর হয়ে যাচ্ছি।

গল্পটা আর দশটা গল্পের মতই শুরু করা যাক। আজ থেকে অনেকদিন আগের কথা.........

তখন আমরা কচি শিশু!!!

আমার ভর্তি হওয়ার ঘটনা বলি। এটা হয়ত অনেকেই জানে না। আমাদের ব্যাচটার ভর্তি প্রক্রিয়া বড়ই অদ্ভূত ছিল। ভর্তি ফর্ম তোলার সময় সবার উচ্চতা মেপে দেখা হত! আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, ৪ ফিট ২ ইঞ্চির বেশি লম্বা হলে নিয়ম ছিল সে ভর্তি পরীক্ষা তো দূরে থাক, ফর্মই তুলতে পারবে না। আমার উচ্চতা ছিল ১ ইঞ্চি বেশি!!(সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃযদিও আমি এখন আহামরি কোন লম্বা না, এটা বললাম কারণ সবাই হয়ত ভাবতে পারে আমি

বোধহয় অনেক লম্বা)।ব্যস্!প্রভাতি শাখায় আমাকে ফর্ম তুলতে দেয়া হল না। আমার এবং আব্বু-আম্মু সহ সবার মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

এসময় কয়েকজন আন্টি আমাকে বুদ্ধি দিলেন যে, দিবা শাখার ফর্ম তুলতে এবং উচ্চতা দেখত আসলে ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে রাখতে। কাজ হল। ফর্ম তুললাম এবং

যথারীতি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তির সুযোগ পেলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার পিছু ছাড়ে না। ঝামেলা হল মৌখিক পরিক্ষার সময়। হেডস্যার ছিলেন শ্রদ্ধেয় হাই স্যার। উনি একটা ৪ ফিট ২ ইঞ্চি বাঁশ নিয়ে বসে আছেন। যার মৌখিক পরীক্ষা, তাঁর আগে উচ্চতা মাপবেন এবং তারপর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। ঢুকলাম স্যার এর রুমে। অনেক ভয় পাচ্ছি লাম। কারণ উচ্চতা তখন আরও একটু বেড়ে গিয়েছে। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয়। যথারীতি হাই স্যার বললেন “কি ব্যাপার। এর উচ্চতা তো বেশি, পরীক্ষা দিল কিভাবে?”

অন্য স্যাররা একে অন্যের মুখের দিকে তাকালেন। কারও মুখে কোনও কথা নেই। আমি একটু ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। হাই স্যার সাথে সাথে বলে

উঠলেন, "এতো ভাল প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত।" আমি কিছু বলার আগেই আমাকে বললেন অভিভাবক কে আছে তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসতে।

আমি আম্মুকে ডাকলাম। আম্মুকে একই প্রশ্ন করলেন যে উচ্চতা বাড়ল কিভাবে? আম্মু বলল যে, আমাদের বাড়িতে সবাই লম্বা। তাই ও দ্রুত লম্বা হচ্ছে। এই সময় আমার বন্ধু তাওহীদ এর বাবা ভেতরে ঢুকলেন। উনি স্যার এর খুব প্রিয় একজন ছাত্র। উনি এসে বললেন স্যারকে বুঝালেন যে সব ঠিক আছে, ওর লম্বা হওয়ার প্রবনতা বেশি এই বয়সে। এটাই স্বাভাবিক।

তখন হাই স্যার আমাকে কোন প্রশ্ন না করে বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে যাও।" অবশেষে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সুযোগ পেলাম বাংলাদেশের এর স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ এ পড়াশুনা করার। একটা কথা না বললেই না, আমার বন্ধু তাওহীদ এর বাবার কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। আল্লাহ উনাকে অনেক ভাল রাখুন এবং দীর্ঘায়ু করুন।

এরপর থেকে শুরু হল স্কুল জীবন। তৃতীয় শ্রেণীতে দিবা শাখায় থাকলেও, চতুর্থ শ্রেণীতে প্রভাতি শাখায় চলে আসি। সেই কারণে দুই শাখাতেই আমার অনেক অনেক বন্ধু। প্রতি বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটির পর খেলতাম আমরা। পুরোটা সপ্তাহ অপেক্ষা করতাম এই দিনটার জন্য। অনেক মজা করতাম। প্রভাতি শাখার ক্লাস শেষ হলে দিবা শাখার ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হাতে সময় থাকত। মাঝে মাঝে একটু বেশি সময় খেলার চেষ্টা করলেই স্যারদের দৌড়ানি খেতাম।

আমরা বন্ধুরা একে অপরের প্রতি ভালবাসা বুঝতে পারলাম যখন আমরা দশম শ্রেণীতে উঠলাম। আর কয়েকদিন পরই আমাদের এস এস সি পরীক্ষা। সবারই মন খারাপ হয়ে গেল শেষ ক্লাস এর দিন। দীর্ঘ ৮ বছরের সমাপ্তি। বন্ধুদের মজার মজার ঘটনাগুলো অনেক বেশি মনে পড়তে লাগল। অনেকগুলোআনন্দঘন মুহূর্ত কেটেছে একসাথে।

আজকে ২০১৮ সাল। আমরা ১৩ বছর হল পাস করেছি। আজ আমরা একজন আরেকজন থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আমরা হারিয়ে যাইনি, এতটুকু ভালোবাসা কমেনি আমাদের মাঝে। সারাজীবন এভাবেই থাকিস তোরা। অনেক অনেক শুভকামনা তোদের জন্য। জীবনে অনেক অনেক বড় হ। (আর কত বড় হবি? সব এক একটা বুড়ো ভাম!!)

লিখেছেন

সৈয়দ আসাদুজ্জামান অপু

মনশেনলাডবাখ, জার্মানি

ইশকুলের ডায়েরি

ডঃ রিম সাবরিনা জাহান সরকার

৯ মার্চ, ২০০০, বৃহস্পতিবার

প্রমিজ করছি এখন থেকে প্রতিদিন ডাইরী লিখবই লিখব। যদি না লিখি, তাহলে কান কেটে পাড়ার শিয়ালরঙ্গা নেড়িটার গলায় ঝুলিয়ে দেব। কিন্তু লিখতে গেলেই যে সব গুলিয়ে যায়। কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখব বুঝে উঠতে পারি না। আজকে একটা চেষ্টা নিয়ে দেখা যেতে পারে। একেবারে সকাল থেকে শুরু করি।

হলুদ বর্ডার দেয়া জাপানী কোয়ার্টজ টেবিল ঘড়িটা সবসময় আমার বিছানায় থাকে। সে হিসেবে তার নাম হওয়া উচিত 'বিছানা ঘড়ি'। ঠিক করেছি তাকে আর টেবিল ঘড়ি ডাকব না। তার বিকট প্রিং প্র্যাং আর্তচিতকারে ধড়ফড় করে জ্যান্ত হয়ে উঠলাম। চোখ খুলে দেখি পৌনে আটটা। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। স্কুল ইউনিফর্মটা আব্বুকে ইস্ত্রী করতে দিয়ে হাতমুখ ধুতে গেলাম। আমার জামা-কাপড় ইস্ত্রী করার এই কাজটা সে খুব আগ্রহের সাথে করে। নাকেমুখে কিছু একটা গিলে চলে গেলাম স্কুলে। প্রথম পিরিয়ডেই পরীক্ষা। সাধারণ গনিত। দিলাম আর কি। ভাল না খারপ হল বুঝে ওঠার আগেই শিবানী আপা এসে হাজির। আমার প্রিয় একজন মানুষ। বলা উচিত না কিন্তু বলেই ফেলি, বায়োলজি আমার ভাল লাগে না। তাই ক্লাসে আমি খুব অন্যমনস্ক। আমার ঝুলিতে শিবানী আপার বকা খাওয়ার অনেক তিতা-মিঠা অভিজ্ঞতা আছে। তারপরও ক্লাসে বসে ঘুম তাড়াতে আমি অক্ষম।

ইংলিশ ক্লাসে কিশোরীমোহন স্যারের অনুরোধে আনুশকা গান শোনালো। ওর গলা যে কি সুন্দর! আফসোস হল গান শিখি নি বলে। টিফিন টাইমে অমিয়কে পাওয়া গেল। তাকে কখনো অমিয় ডাকা হয়, কখনো মুনরবি। ওর নামটা সুন্দর, মুনরবি অমিয়। অমিয়র গানের গলা অসাধারণ। "ভালো আছি, ভালো থেকো"- এই গানটার একটা ফাজিল সংস্করণ লিখেছে আমাদের ধুমকেতুর ফাহিম। অমিয় গানটা দারুণ করে গাইতে পারে। আজকে ওকে দেখামাত্র পাকড়াও করলাম। গানটার লিরিক্স লেখালাম ডাইরীতে। ভাল কথা, অমিয়র টাইটেল দেয়া হয়েছে "লিটু আনাম"। মারাত্মক এই টাইটেল শুনে সে কি করে সেটা খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। তাহসীনার কাছ থেকে ফেয়ারওয়েলের দুইটা ছবি নেয়া হয়েছিল। নাভিদকে দিয়ে সেগুলো ডেভেলপ করানো হয়েছে। একটা ছবিতে শুধু ছেলেরা। আরেকটা সবার কম্বাইন্ড ছবি। ছবির মোটামুটি সবাইকে টাইটেল দেয়া হয়েছে। স্কুলের দারোয়ান আজিজ ভাইয়ের নাম অনুপম খের আর ঝন্টু ভাই শাহরুখ খান। রাশিন হল সালমান খান, আস-সাবা বাংলা সিনেমার ভিলেন আলেকজান্ডার বো আর আমাদের রুবাব হল এ্যাকশন হিরো রুবেল।

কালকে ফাইজা আর আমার নতুন উদ্যোগ Love Letter Agency (LLA) এর প্রথম চিঠিটা লেখা হল। আগের দিনও একটা লিখেছিলাম। "ক" কে দেয়া মাত্র সে দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়েছে। ফাজিল! কিন্তু LLA'র ট্যাগ লাইনই হল "আমরা বিশ্বস্ততায় বিশ্বাসী, বাস্তবে নয়"। সুতরাং আরেকখানা পত্র রচিত হইল। সেটা অনেকটা এরকমঃ ('অনেকটা এরকম' বলছি একারণে যে এই চিঠিটাও সে টান মেরে ছিড়ে ফেলে দিয়েছে):

"৭৮৬/৪২০

যাও পাখি বলো তারে সে যেন ভোলেনা মোরে।
'দোয়াগো'

প্রিয় ভাতিজারে,

তোমার আবু-লাবু-বাবু চাচ্চু-চাচী আম্মাকে আমাদের কলিজা নিঙরানো শ্রদ্ধা ও সালাম জানিয়ে পাঁটের আশঁ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধে দিবে। আনোয়ার স্যার কিংবা মালাইকারি (মালাকার) আপা- এ দু'জনের মধ্যে যার মাথায় চুল কম তার চুলের সমান, মানে তত পিকোসেকেন্ড তোমার পরমায়ু হোক।

পর সমাচার এই যে, গতকাল কার কাছে যেন শুনলাম তুমি নাকি শনিবারে শনির আখড়ার বিখ্যাত স্যুয়েজ পাইপের কাছে ডাকু দল হালাকু খাঁ কর্তৃক ধৃত হয়ে সর্বস্ব খুঁইয়েছ (inside+outside)। আঃহারে, চুক চুক চুক... এবার কাজের কথায় আসি। নান্দাইলের ইউনুস তোমাকে দেখতে চেয়েছে। আগামীকাল মাঝরাতে গুলিস্তানের গলাচিপা গলিতে পৌনে তিন নাম্বার টিউবলাইটের থাম্বার পাশের লজ্জাবতী গাছের তলে বোরখা পরে রামদা হাতে সে অপেক্ষায় থাকবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, এই যে দুনিয়া/কিসের লাগিয়া। দে দৌড়! তুমি আর বেশিদিন নাই।

ইতি

কষ্টে আছি আইজুদ্দিন

কাগজের উল্টা পৃষ্ঠায় লিখে দিয়েছিলাম, "আমরা বিশ্বস্ততায় বিশ্বাসী, বাস্তবে নয়।"

অনেক রাত। কিছুই পড়ি নাই আজকে। লেখাপড়া যে করি না সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে! তাতে খুব বেশি কিছু আসে যায় না আমার। কারণ আমি বাস্তবে বিশ্বাসী না। LLA effect!!

লিখেছেন

ডঃ রিম সাবরিনা জাহান সরকার

মিউনিখ, জার্মানি

লীলাবতী

- মন খারাপ?
- না, খুব জটিল একটা সমস্যা নিয়ে ভাবছি। আচ্ছা বলতো পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কণার নাম কি?
- সাইন্স সম্পর্কে আমার ধারণা খুব কম । ছোটবেলায় পড়েছি পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ হল অ্যাটম। এটাকে আবার ভাঙ্গলে নিউটন আরও হাবিজাবি কি কি পাওয়া যায় । সবই মুখস্থ বিদ্যা। এগুলো কিছুই বুঝতাম না। মনে হতো কেউ একজন ইচ্ছেমত যা মন চায় লিখছে আর আমরা পাশ করার জন্য মুখস্থ করতাম।
- তোমার সেই ছোটবেলাতো এখন আর নেই। পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে, সবচেয়ে ছোট কণার নাম কোয়ার্ক। অনুমান করতো কোয়ার্কের সাইজ কেমন হতে পারে?
- অ্যাটম থেকে ছোট? নাকি আরও ছোট ?
- হা হা , এক সেন্টিমিটারের মিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন ভাগ
- আমার কেন জানি এইগুলা বিশ্বাস হয় না, এত ছোট জিনিস পরিমাপ করবে কি করে? আচ্ছা বাদ দাও । এইগুলা উদ্ভট বিজ্ঞানের কথা রাখো এখন।

একটা কাজ করে দাও। আমার খুব কাছের এক বান্ধবীর মেয়ে হয়েছে। এখন সে আমাকে খুব করে বলছে একটা সুন্দর নাম রেখে দিতে । আমার মাথায় কিছু আসছে না। প্লিজ তুমি একটা বলে দাও ।

- কোয়ার্ক রেখে দাও ।
- আমি ফোন রাখলাম।
- আরে মজা করলাম। আচ্ছা দাড়াও একটু চিন্তা করি।
- “লীলাবতী” রাখতে বলতে পারো। লীলাবতী ছিল ভারতের বিখ্যাত গণিতবিদ ভাষ্করাচর্যের কন্যা। যদিও লীলাবতীর জীবনে অনেক দুঃখ ছিল। ভাষ্করাচর্য তার কন্যাকে ধীরে ধীরে পাটিগণিত শেখান। আর তিনি চেয়েছিলেন তার কন্যাকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মনে রাখুক তাই তিনি পাটিগণিতের একটি বইটি লিখেন এবং মেয়ের নামে নাম দেন, “লীলাবতী” ।

লীলাবতী

“Whilst making love a necklace broke.
A row of pearls mislaid.
One sixth fell to the floor.
One fifth upon the bed.
The young woman saved one third of them.
One tenth were caught by her lover.
If six pearls remained upon the string
How many pearls were there altogether?”

লীলাবতী বইটির শেষ দিকে ভাস্করাচর্যের একটা কথা ছিল

“এই পৃথিবীতে সুখ আর সমৃদ্ধি গুণিতক হারে বৃদ্ধি পাবে যদি লীলাবতীকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে”

- আচ্ছা এখন রাখি, বান্ধবীকে ফোন করে নামটা বলি ।

তন্দ্রা ফোন রেখে দিয়েছে আমি জানি একটু পরেই সে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে লীলাবতী নামের অর্থ কি। আমি যখন বলবো, যে লীলা করে বেড়ায় সেই লীলাবতী তখন তন্দ্রা খুব রাগ করে ফোন রেখে দিবে।

আমি অনেকক্ষণ ফোন না দিলে সে নিজেই মোবাইলে মেসেজ দিবে কিন্তু সেই মেসেজে কোন শব্দ থাকবেনা, থাকবে কিছু অদ্ভূত সিম্বল। কিছু শব্দহীন অভিমান। সে বার বার তার রাগ কেন ভাঙ্গাচ্ছি না সেটার নিঃশব্দ সিগন্যাল দিতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ফোন দিয়েছি।

পুনশ্চঃ এই লেখাটার স্থান অনেক প্রশস্ত, বাংলাদেশ থেকে জার্মানি পর্যন্ত ।

আবারও পুনশ্চঃ আমি কোন লেখক নই । কিন্তু মাঝে মাঝে কেন জানি লিখতে ইচ্ছা করে, বিশেষ করে রাতে। রাত যত গভীর হয় আবেগ তত তীব্র হয়। মনের মধ্যে এত সুন্দর সুন্দর কথা ঘুরপাক খায়, আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই । কিন্তু পরে যখন লিখতে বসি সেই মুহূর্তের আবেগটুকু আর থাকেনা। যা লিখি সেটা নিজেই ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে।

তাই নিজের এই লেখাগুলা “আমার ছেড়া খাতা” ব্লগে লিখে রাখি মাঝে মাঝে। আমার লেখার কেন্দ্রীয় চরিত্রে থাকে তন্দ্রা নামে একটি মেয়ে আর অমিত নামের একটি ছেলে। তন্দ্রা সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটি চরিত্র , এখন পর্যন্ত এই চরিত্রটি লেখার সময় বাস্তবের কাউকে কল্পনা করিনি। কিন্তু অমিত চরিত্রটি লেখার সময় মাঝে মাঝে নিজেকে এই চরিত্রের মধ্যে ভাবতে শুরু করি। পরক্ষণেই বুঝতে পারি আমি কোন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, আমি অতীব সাধারণ শ্রেণীর একজন। তখনই আমি অমিত চরিত্রের ছায়া থেকে সরে বাস্তবতায় ফিরে আসি। আমাকে ক্লাস করে এসে কি খাবো সেটা চিন্তা করতে হয়, রান্না করতে হয় কিন্তু গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রদের তা করতে হয় না ।

ইমন বায়েজিদ
শিক্ষার্থী
এমএসসি ইন সফটওয়্যার সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিংঃ
আর ডব্লিউ টি ইউনিভার্সিটি
আখেন, জার্মানি
https://www.facebook.com/imonbayazid

উৎসবে মাতি, কাছে কিবা দূরে

প্রবাসের উৎসব ব্যাপারটা কি জিনিস সেটা নিয়ে আমার এই জীবনে চিন্তা করার সময় কিংবা সুযোগ কখনওই হয়ে উঠেনি। বিদেশ বলতেই আমরা যেমন চিন্তা করি - সুন্দর রাস্তা-ঘাট , পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আর সুন্দর সুন্দর কিছু লোকেশন।

হ্যাঁ,আমার ভাবনা এর চেয়ে মোটেও আলাদা কিছু ছিলনা। হ্যাঁ , সুন্দর রাস্তাঘাট কিংবা সুন্দর পরিবেশ সবই পেয়েছি, কিন্তু যেটা বিদেশে এসে আবিষ্কার করেছি তা হল কেমন একটা যান্ত্রিকতা আছে এখানের মানুষগুলোর মাঝে। ঢাকা শহরে আমরা যারা বড় হয়েছি তাদের হয়ত মনে হতে পারে যে, এ আর নতুন কি? ঢাকা শহরের মানুষদের মাঝেও সেটা আছে। আমি তাদের সাথে একমত হলেও সেটা পূর্নাংশে নই।

কারন ঢাকা শহরের যান্ত্রিকতার চেয়েও হাজার গুন বেশি যান্ত্রিকতা এখানে আছে। আর আমরা হলাম বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন করা জাতি। আমাদের কাছে উৎসবে ছুটি না পেলে, কিংবা কোথাও একটু ঘুরতে না গেলে, সবাই মিলে পরিবারের সাথে উৎসব পালন না করলে তা রীতিমত বিভীষিকা ঠেকে।তাহলে বুঝুন, যখন ঈদের দিন আমার দুইটা সাইন্টিফিক পেপারের প্রেজেন্টেশনের রিভিউ পাঠাতে হয়, বিকেলে আবার ক্লাস থাকে তখন তার কাছে এমন ঈদ তো একটু বেশিই নিষ্ঠুর ঠেকে।

ঈদের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে হল দেশে থাকতে মসজিদের ইমামের কথা শুনতে শুনতে এইবার আর ঘুম ভাঙল না। কি আর করা। মাথায় এক জিনিস ঘুরতে থাকল, যত যাই হোক মন খারাপ করা যাবেনা। না হলে কিছুক্ষন পরে মা'কে ফোন করলেই সে ধরে ফেলবে। ছেলে ছাড়া প্রথম ঈদ তার। তার মন খারাপ হবে এমন কিছু করা যাবেনা। বিদেশে থাকলে আসলে পরিবারকে ভাল রাখার জন্য নিজে ভাল থাকার অভিনয় ঠিকই শিখে যায় সবাই।

ঘুম থেকে উঠেই গোসল করেই হাতড়ে বেড়ালাম প্রিয় পাঞ্জাবিটা। কিন্তু মা আমার ভুলে পাঞ্জাবি দেয়নি। শুধু পায়জামা দিয়েছে। মনে মনে একলা একটু হেসে টিশার্ট আর জিন্স পড়েই রেডি হয়ে গেলাম।বের হওয়ার সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলাম বাইরে ভালই ঠান্ডা পড়েছে, আকাশও মেঘলা। উইন্ড জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে ট্রামে উঠে মাকে ফোন দিলাম। মা আমার একটু বেশি আবেগী কিনা, সে পারলে ফোনের ওপাশে বসেই আমাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দেয়।

তার কড়া অর্ডার, মসজিদ থেকে বের হয়েই যেন কিছু মিষ্টি জাতীয় খাবার বাসায় নিয়ে যাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলাম। নামাজ আদায় করলাম এক পাকিস্তানি মসজিদে। নামাজ শেষে অবাক করে দিয়ে তারা কাস্টারড খাওয়ালো। আমি তো বেজায় খুশি! কাস্টার্ড খাওয়ার জন্য না, নামাজ শেষে এই বৃষ্টিতে মিষ্টি জাতীয় কিছু খুজতে হবেনা সেই সুখে!!!

নামাজ শেষে মাকে এই মিষ্টিমুখের কথা বলায় সে বলেই ফেলল- আল্লাহ মায়ের দোয়া কবুল করেছে!!!

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাসায় ফিরলাম। এসে খিচুড়ি বসিয়ে দিলাম। এর পর পড়তে বসলাম। এর মাঝে অবাক করে দিয়ে Dusseldorf-এর এক বড় ভাই ফোন দিয়ে দাওয়াত দিল। একে আমি নতুন, তাই কিছু জানি না চিনি না। আমি খুব খুশি হয়েই ভাইয়াকে ধন্যবাদ দিলাম। মাঝে মাঝে ছোট কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলে জীবনে বড় বড় ভাল লাগা কাজ করে।

বিকেলের দিকে মুভি দেখতে বসলাম ক্লাসে না গিয়ে। সন্ধ্যায় এক ফ্রেন্ড আসল বাসায়। আড্ডা দিতে দিতেই রাত হয়ে গেল।কিভাবে ঈদ শুরু হল আর কিভাবে শেষ হল সেটাই বুঝলাম না। তবে পরের দিন বাংলাদেশে ঈদ ছিল, আর ফেসবুকের কল্যানে সবার এত এত রঙ্গীন ছবি দেখে আমি সত্যিকারের বাংলাদেশের ঈদ মিস করছিলাম। হায় আফসোস!

লেখার শেষে একটা কথাই বলবঃ নিজের জীবন নিয়ে কখনও অভিযোগ করবেন না। কারন আপনার থেকেও কষ্টে অনেকে উৎসবের দিনটা পালন করছে। আপনার কাছে দিনটা একঘেয়ে, ঘুমিয়ে কাটানো বৈচিত্র্যহীন হতে পারে। কিন্তু আপনার মায়ের কাছে সেই উৎসবের দিনেও আপনি আছেন। সেটা ঘুমিয়ে থাকুন কিংবা ঘরে বসে থাকুন না কেন। জীবনে যেমনই থাকব বলব - "আলহামদুলিল্লাহ্"। অশেষ কৃতজ্ঞতা!

-
নওশাদ তূর্য
মাস্টার্স শিক্ষার্থীঃ মেডিকেল সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং, অটো-ফন-গ্যোরিক বিশ্ববিদ্যালয়
মাগ্দেবুর্গ, জার্মানি

কানে ধরার দল

গ্রামের সব বৈশিষ্ট্যই ছিল আমাদের গ্রামটায়। শৈশব কৈশোর এবং তার পরেও, মেঠো পথ, বিস্তীর্ণ ধানের মাঠ, ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ আদৌ আসবে কিনা সেই চিন্তা কেউ করতো না। বর্ষার চিত্রও ভরসা করার মত ছিল না। তখন একমাত্র যানবাহন নৌকা, চারদিকে সবুজের সাথে সমানতালে মিশে ছিল দারিদ্র্যের শোষণ। ছেলেমেয়েদের স্কুলে এজন্যই পাঠানো হত যে বাড়ির কাছে একটি স্কুল আছে। অথবা অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাটা যখন বিনে পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে তখন কেন স্কুলে পাঠাবে না? চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে-মেয়েদেরও প্রাইমারী স্কুলে আসা স্বাভাবিক ছিল আর শিক্ষকরাও পড়ানোর জন্য কাউকে পেয়েই খুশি ছিল। ভর্তি করানোর পর ছেলে বা মেয়ে এক ক্লাসে কয় বছর পার করছে- তার খোঁজ নিত নিতান্তই দু'এক জন মা বাবারা। এই যখন অবস্থা তখন আব্বু বলল আমায় স্কুলে দিবে। আমি বাড়ির বন্দিখানা থেকে মুক্তি পাবো আর নতুন খেলার সাথি পাবো, সেই আনন্দে নাচতে নাচতে আব্বুর সাথে স্কুলে এলাম। এসে দেখি যারা ভর্তি হবে তারা মাথার পেছন দিকে হাত ঘুরিয়ে কান ধরে ধরে লাল করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ সময় লাগল ব্যাপারটি বুঝতে। এরপর সবার অলক্ষ্যে আমিও চেষ্টা করলাম। পারলাম না। তাহলে কি আমি ভর্তি হতে পারবো না? সুপারম্যানের (মানে, আমার বাবা) শার্টের কোনা টেনে ধরলাম।

আমার দিকে তাকাতেই আস্তে করে বললাম, আব্বু আমি তো কানে ধরতে পারিনা। উত্তরে সুপারম্যান একগাল হেসে বলল, তুইতো নাম লিখতে পারিস। সেই যাত্রায় বেঁচে গেলেও পরের যাত্রায় রক্ষা পাইনি, কানে ধরার দলে ভর্তি হলাম, সুপারম্যান আমাকে প্রথম বেঞ্চে দুইটা ছেলের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। এরা একজন আমাকে কলম দিয়ে হাতের মধ্যে খোঁচা মারে তো আরেকজন বলে ওঠে, 'এরোওও ইগার আব্বা কইছে ইগারে মাইততি না'। আমি ভাবি যাক তাহলে মনে আছে। কিছুক্ষণ পর আমার পিঠে দুম করে এক কিল। তারপর 'এরোওওও ইগার আব্বা কইছে ইগারে মাইততি না...'। শুনে আমি তবু স্বান্তনা পাই। এরপর চুলে হঠাৎ হ্যাঁচকা টান। আমি মাগো বলার আগেই 'এরোওওওও ইগার আব্বা কইছে ইগারে মাইততি না....।' স্যারদের কাছে নালিশ করলে সর্বোচ্চ শাস্তি কানে ধরা এবং তা তারা হাসিমুখেই মেনে নিতো। এই ছিল আমার 'কানে ধরার দল'-এ মিশে যাওয়ার গল্প, যা আজো আমাকে আনমনে হাসায়। সেই পাঁজিগুলো আজ কে কোথায় আছে জানিনা। ওদের জন্যই স্কুল জীবনের প্রথম দিনটি আমি কখনো ভুলবো না। ওরা যেখানেই থাকুক সৃষ্টিকর্তা যেন তাদের ভালো রাখে

জান্নাতুন নাঈম বীথি,
নোয়াখালী, বাংলাদেশ

ফটো গ্যালারী

কৃতজ্ঞতাঃ ইমন বায়েজিদ

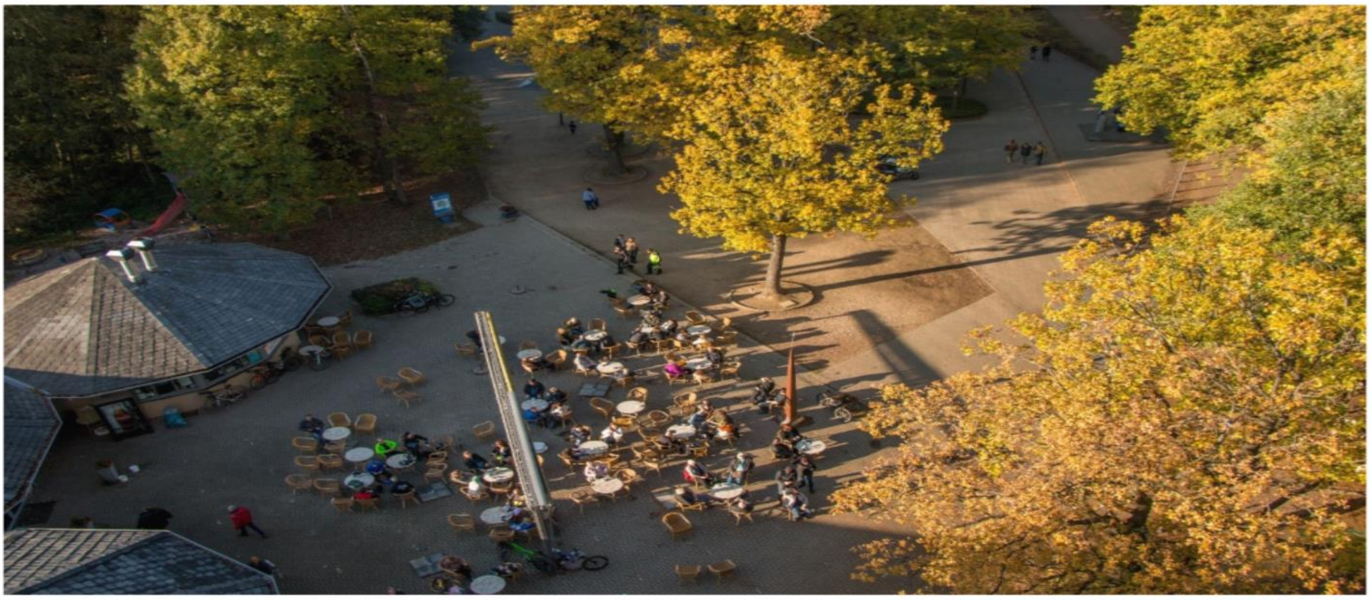

Theme: A Cup Of Relax

Theme: A Glimpse of Nature Always Revives My Mode

Theme: Into The Dream

"আমিও ছুটে যাই সে দিগন্তে
আমিও ধেয়ে যাই কি আনন্দে
তুমি কি, ভুলে যাওয়া কবিতারা.
তোমার ছুঁতে চাওয়ার মূহুর্তরা,
কে জানে, কি আবেশে দিশাহারা

Theme: Light Your Mood

ধূসর সময়ের গল্প

“I still have thought of you with kindness, and shall do, till our last good-night. The ever-rolling silent hours Will bring a time we shall not know. When our young days of gathering flowers, Will be an hundred years ago.”

Place: This photo was taken in a Church of Lubeck, Germany. An absentminded lady was sitting in the church and looking to the infinity. Seems like she is reminding her sweet memories with someone special.

Time: July 28, 2018

সোনার তরী

ছবিটি তোলা হয়েছে ডিঙ্গাপোতা হাওড় থেকে। এটি নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার অনেকগুলো বিশাল হাওড়ের মাঝে অন্যতম। চোখের সামনে একের পর এক ঢেউ, সাগর সমান বিশাল জলরাশি। অন্যসময় ধানের ক্ষেত থাকে তা বিশ্বাসই করা দায়।

সময়ঃ ২৯ জুন, ২০১৬

Photographer Detail

Zubair Hossain (Sami) is currently a student of Technical University Berlin, studying master's in computer science. Photography is his passion. He usually takes landscape, life style and kid photography. He loves to travel and show that place though his third eye.

Facebook: https://www.facebook.com/zubair.h.sami

নোটিশ

"ছবি মেলা"

সৃষ্টির আনন্দে তৃপ্তি আসেনি, এমন কখনো কারো ক্ষেত্রে হয়েছে কিনা বলা কঠিন। আরো বেশি কঠিন, সেই আনন্দ কাছের বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করে স্বস্তি আর সার্থকতা পায়নি, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া। "ছবি তোলা" এই সৃষ্টিশীল প্রতিভার একটা বড় স্বাক্ষর খোদাই করে।

হতে পারে শীতের ভোরে ঘুম থেকে উঠে জানালার ধার ঘেসে কুয়াশাসিক্ত নুইয়ে থাকা শিশির ভেজা পাতাগুলোর আর্দ্র সৌন্দর্য হতে পারে আপনার সৃষ্টি, হতে পারে গ্রীষ্মের দাহ্য গরমে বিস্তৃত নদীতে দূর দিগন্তের খোলা আকাশের ডুব দেয়ার মুহূর্ত হতে পারে আপনার সৃষ্টি, হতে পারে শেষ বিকেলে ব্যস্ত পৃথিবীর ঘরে ফেরার তৃপ্তি আপনার সৃষ্টি, হতে পারে একটা পটভূমিতে ল্যাম্প-পোষ্ট কে কোণায় বন্দি করে বাকি পৃথিবীর অন্ধকারকে নতুন করে সৃষ্টি, হতে পারে আমার স্মরণীয় মুহূর্তের সেই ছবি যেটা কে প্রতি বার নতুন করে আপনারই সৃষ্টি। এরকম আরো অনেক রকম সৃষ্টিশীল বিষয় নিয়েই জার্মান প্রবাসে শুরু করতে যাচ্ছে "ছবি মেলা"। আর, ছবিগুলো হবে আপনাদেরই।

ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা বা তোলা হয়ত স্মার্ট ফোনে, আজই শেয়ার করুন আমাদের সাথে। ছবি জমা দিতে শুধুমাত্র আমাদের ফেইসবুক পেইজে পোষ্ট করলেই হবে। এখান থেকে নির্বাচিত ছবি গুলো যাবে পরের সংখ্যার ম্যাগাজিনে। আপনাদের সুবিধার্থে ছবি জমা দেয়ার কিছু নিয়মাবলী দেয়া হল। চোখ বুলাতে ভুলবেন না।

১) ছবির রেজুলেশন নুন্যতম ২ মেগাপিক্সেল হতে হবে
২) ছবির সাথে অবশ্যই ছবির প্রেক্ষাপট বা বর্ণনা (যেটা ফটোগ্রাফারের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ) থাকতে হবে। (বাংলা বা ইংরেজিতে)
৩) ছবি তোলার জায়গা এবং তারিখ
৪) ফটোগ্রাফার-এর নাম এবং ঠিকানা

ছবির পাঠানোর জন্য বিস্তারিতঃ http://goo.gl/90IVlk

চোখ রাখুন পরবর্তী আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেইজ " জার্মান প্রবাসে"

আর যেকোনো কিছু জানতে german.probashe@gmail.com -এ ইমেইল করতে পারেন।

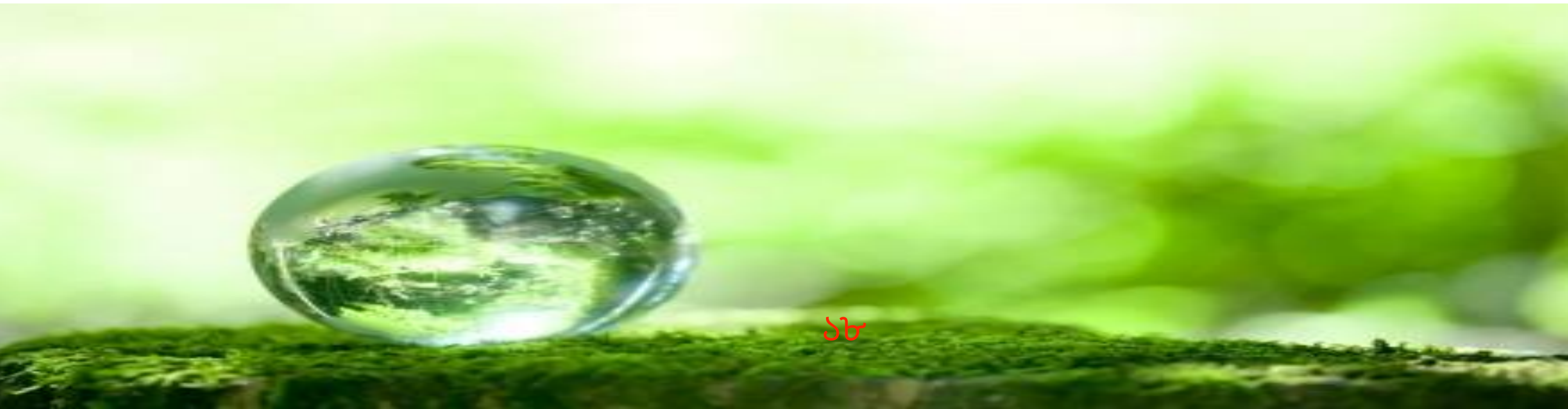

পরবর্তী সংখ্যার ম্যাগাজিনের থিম: "কীর্তিমতী সাহসিকা"

সভ্যতার গোড়া হতে আজ পর্যন্ত পৃথিবী পরিশীলতা লাভ করেছে যাদের কারণে নারীর ভূমিকা তাতে আধাআধি। পুরুষের হাতে হাত রেখেই নারীরা ইতিহাসের পাতা স্বর্ণালী করে তুলতে রেখেছে অবিস্মরণীয় ভূমিকা। একজন ক্লিউওপেট্রা যেমন রুপ রস আর মোহময়ী ক্ষমতাধারী অপরদিকে মহারানী ভিক্টোরিয়া এক শক্তিমান শাসক। আছে মাদার তেরেসার মত অবতার। মেরি কুরির পদার্থ ও রসায়নে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা কে না জানে। আমাদের বেগম রোকেয়া সুফিয়া কামালের ধারাবাহিকতায় আজকে সেনা, নৌ, পুলিশবাহিনীতে নারীর জয়জয়কার। আকাশপথেও নারীর উদ্দীপ্ত পদচারণা। গত প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে নারী। সুতরাং নারীরা আর সেই অবলা নেই। বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তিসহ উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর এখন সম্মানজনক অবস্থান।

আসছে মার্চ মাস, নারী দিবসের মাস। দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের অধিকারের দিক দিয়ে বাংলাদেশ প্রথম। বহু সামাজিক বাঁধা সত্বেও বাংলাদেশের মেয়েরা পতির সংসারে গিয়ে দু'পয়সা হিসাব জানার জন্যে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াকে পর্যাপ্ত মনে করে না। দেশে তাঁরা উচ্চশিক্ষার্থে ছেলেদের থেকে এগিয়ে শুধু তাই নয়, বিদেশেও তাঁরা সমানতালে প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বাইরে যারা পড়ছেন বা কাজ করছেন (নারী), এবারের সংখ্যায় আপনাদের লেখা চাই। সামাজিক, পারিবারিক, আর্থিক সমস্যার বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে কী করে এখানে এসে পৌঁছুলেন লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের।

ডেডলাইনঃ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

লেখা পাঠানঃ German.Probashe@gmail.com
অথবা পেজের ইনবক্সে পাঠানঃ www.facebook.com/pages/জার্মান-প্রবাসে/212610425614429
ছবির পাঠানোর জন্য বিস্তারিতঃ http://goo.gl/90IVlk

লেখার সাথে নাম ঠিকানা পেশা আর একটি ছবি অবশ্যই পাঠাবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শুধু জার্মানি বা বাংলাদেশ থেকেই নয়, যেকোন দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাদর আমন্ত্রণ আমাদের ম্যাগাজিনে! তাই আমাদের ম্যাগাজিনে লিখতে হলে আপনাকে বাংলাদেশ বা জার্মানিতেই থাকতে হবে অথবা আমাদের ধরিয়ে দেওয়া টপিকেই লিখবে হবে এমন কোন কথা নেই! যে কেউ যেকোন দেশ থেকে যেকোন টপিকে লেখা পাঠাতে পারেন।

[redacted]

টিম জার্মান প্রবাসে

চিফ এডিটরঃ দেবযানী ঘোষ, উলম

এডিটরঃ জাহিদ কবীর হিমন, বার্লিন

কো-এডিটরঃ ড. রিম সাবরিনা জাহান সরকার, মিউনিখ

চিফ মার্কেটিং অফিসারঃ আনিসুল হক খান, মিউনিখ

চিফ অর্গানাইজিং অফিসারঃ হোসাইন মোহাম্মাদ তালিবুল ইসলাম, মিউনিখ

গ্রাফিক ডিজাইনারঃ শেখ মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন নাঈম, মাগদেবুর্গ

কোওর্ডিনেটরঃ রশিদুল হাসান, উলম

কোওর্ডিনেটরঃ শরিফুল ইসলাম, মাগদেবুর্গ